জঙ্গল মহল : ক্ষুধার্ত মানুষের কাঁধে বন্দুক রেখেই চলেছে ক্ষমতার লড়াই

সুযশ মণ্ডল

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই যে, এই একুশ শতকে গোটা পৃথিবীতে সন্ত্রাসবাদ সবচেয়ে আশংকার বিষয় ও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের পাশাপাশি আরেক ধরণের এবং রাজনৈতিক মৌলবাদ সমন্বিত সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চায়। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই সন্ত্রাসবাদ বর্তমানে সরকারের পক্ষে মারাত্মক মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাত্ত্বিক দিক থেকে একে 'মাওবাদ' বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। মাওবাদীদের লক্ষ্য হল সন্ত্রাসের দ্বারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করা। যদিও মাওবাদীরা নিজেদের কার্যকলাপকে 'বিপ্লবের পথ' বলে আখ্যা দিচ্ছে কিন্তু নকশাল বাড়ির রাজনীতি শুরু হওয়ার পর থেকে একজন পুঁজিপতি - বৃহৎ জোতদারও এদের হাতে খুন হয়নি। তার মানে এই নয় যে গণহত্যা - সমর্থন যোগ্য। বলা হচ্ছে, যারা শ্রেণী বিপ্লব করতে চান, তারা শ্রেণী শত্রু হত্যা না করে, যারা শ্রেণী মিত্র হতে পারে তাদেরই হত্যা করেছেন। যে কার্যপদ্ধতি মার্কসবাদ - লেলিনবাদ সম্মত নয়। এমনকি মাও - জে-দং এর চিন্তারও অনুসারী নয়। চিনে কখনো 'মাওবাদ' বলে কোন শব্দ ব্যবহার করা হয় না। মার্কসবাদই হল আসল। মাও স্রেফ চিনের উপযোগী করে প্রয়োগ করেছিলেন। মাও নিজেও 'মাওবাদ' বলে কোন শব্দের অনুমতি দেন নি। তাই আমাদের দেশের মাওবাদীদের কার্যকলাপ সন্ত্রাসবাদ ছাড়া যে আর কিছুই নয় তা তারা প্রাত্যহিক পরিণাম বিহীন রক্তক্ষয়ী আক্রমনের মাধ্যমে প্রমানিত করছে।

প্রাত্যহিক সংবাদ পত্রের পাতায় চোখ রাখলে রক্তপাত নির্মমভাবে হত্যা রাস্তায় পড়ে থাকা অর্ধনগ্ন বা ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া মৃতদেহের ছবি দেখতে দেখতে যে কোন বিবেকবান মানুষের শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে যাবে। চোখ বন্ধ রাখলেও মানসিক ভাবে রক্তক্ষরণ ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। আজ শালবনী, কাল শিলদা, পরশু হয়তো বিনপুরে বা লালগড় বা নয়াগ্রামে। কেউ কিন্তু বলতে পারছে না এই এত রক্ত বন্ধ করার দায়িত্ব কে নেবে। সংবাদ পত্রগুলির প্রধান খবরই এখন জঙ্গল মহল। একটি খুনের বদলা নিতে আর একটি খুন। ঐ খুনের প্রতিশোধে হয়ত আর একটি খুন। কিন্তু কেন এমন হল। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা শান্তশিষ্ট জঙ্গল মহলে?

ছোটবেলা থেকে জঙ্গল মহলে থাকার ফলে যেটুকু দেখছি ও উপলব্ধি করেছি তাই পাঠকগনের কাছে বলার চেষ্টা করছি। জঙ্গল মহল মূলত পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলাকীর্ণ অংশ নিয়ে গঠিত। বেশীরভাগ অঞ্চলই রুক্ষ; অনুর্বর লালমাটি দ্বারা গঠিত উঁচু-নীচু ভূমিরূপ। অধিকাংশ মানুষই তফশীলি উপজাতি বা দলিত শ্রেণীর। প্রধান জীবিকা পশুপালন, পাতা সেলাই, কেন্দু পাতা তোলা, কাঠ কাটা, মুরগী লড়াই, বাবুই দড়ি তৈরী, হাড়িয়া ও মহুয়া প্রস্তুত ও দিন মজুর খাটা। বেশীরভাগ মানুষই ভূমিহীন। কিন্তু বর্তমান আর্থ সামাজিক অবস্থায় এসব জীবিকার উপর নির্ভর করে অন্তত পক্ষে মানুষের মত বাঁচা যায় না। এর সঙ্গে উপরি পাওনা হিসেবে আছে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু, কোন সুষ্ঠু রেশনিং ব্যবস্থা নেই, গর্ভবতী মায়েরা ও শিশুরা অপুষ্টিতে ভোগেন, শিশুরা ন্যূনতম শিক্ষার সুযোগ পায় না। (অবশ্য খালি পেটে পড়াশোনা হয় কিনা জানি না)। সঙ্গে তথাকথিত জঙ্গল দস্যুদের প্রতিনিয়ত অত্যাচার। অর্থাৎ অনুন্নয়নই ওদের সুষ্ঠু ভাবে জীবন নির্বাহের প্রধান অন্তরায়।

এখন এমন যে গত চৌত্রিশ বছরে ওদের অবস্থা হঠাৎ করে শেয়ার মার্কেটের মত ধসে গেছে। আমরা যদি ইতিহাসের পাতার দিকে তাকাই, তবে দেখবো যে সাঁওতাল বিদ্রোহও অনুন্নয়নের বিরুদ্ধে এক বৃহৎ সংগঠিত স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের ফসল ছিলো। কিন্তু গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, শাসকদের চামড়ার রঙেও পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু আদিবাসী সমাজের কোন পরিবর্তন হয়নি। আমাদের আজ লজ্জা পাওয়া উচিৎ যে, যে দেশে সবচেয়ে বেশী বিলিয়নার, সেই দেশে স্বাধীনতার চৌষট্টি বছর পরও জঙ্গল মহলের লোকেরা পিঁপড়ের ডিম খায়, কচু সেদ্ধ খায়। না খেতে পেয়ে মৃত্যুকে বরণ করে এবং মৃত্যুর পরও মৃত ব্যক্তির আত্মাকে শুনতে হয় 'বেশী খেয়ে মারা গেছে'। তাই জঙ্গল মহলের মাওবাদী কার্যকলাপের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতি শুধুমাত্র আইন শৃঙ্খলার অবনতি জনিত বিষয় হিসেবে দেখলে সরকার ভুল করবে। অবশ্য মানুষের জীবন নিয়ে অনবরত ভুল করার অধিকার সরকারের আছে। কারণ পরে তো হাত জোড় করে বলেই দিলেই হল, 'ওটা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল।' পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার নোটিফায়েড কিছু ব্লকের আদিবাসী; দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ অধিকাংশ দিন অর্ধাহারে, অনাহারে দিনাতিপাত করেন। এদের জীবন জীবিকা স্বাস্থ্য পরিবেশ এবং সন্তান - সন্ততিদের শিক্ষার কথা কখনোই প্রয়োজনীয় গুরুত্ব সহকারে ভাবা হয়নি। আগে ব্রিটিশরা ভাবেননি, এখন বর্তমান সরকার ও কিছুদিন আগে পর্যন্তও ভাববার সময় পায়নি। এখন হয়তো ঠেলায় পড়ে বড্ড বেশী উন্নয়নের কথা মুখে বলে ফেলছেন। এতদিন পর্যন্ত সরকারেরা না পেরেছে বনজ সম্পদ রক্ষা করতে, না দিয়েছে বন্য আদিবাসীদের ন্যূনতম মানুষের মত বাঁচার সুযোগ। কিন্তু মহাকরণে আদিবাসী অনগ্রসরদের জন্য মন্ত্রী আছে, রয়েছেন পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তরের 'অন্য কাজে ওস্তাদ' এক

মন্ত্রী। আসলে দেশে রাজনীতিকর চিত্রকলা ভেবে এসেছেন, যেহেতু সমাজের প্রান্তিক মানুষ সব অর্থে দুর্বল। তাই সংগঠিত প্রতিবাদের আশংকা এদের তরফে প্রায় নেই বললেই চলে। অতএব অবজ্ঞার মাত্রা চড়তে সময় লাগেনি শাসকদের। এতকিছু সত্ত্বেও জঙ্গল মহলের সাধারণ সরল শান্ত মানুষেরা এই বঞ্চনাকেই ভবিতব্য বলে ভেবে এসেছেন। ঠিক তখনই উদ্ভব হয় এক অন্য রকম পরিস্থিতি।

আমরা যেমন বিভিন্ন ধরনের পেশাকে জীবন ধারনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করি, ঠিক তেমনি কিছু বিকৃত মানসিকতার মানুষ সন্ত্রাসবাদকে জীবন ধারণের পেশা হিসেবে নেয়। এরা মুখে অনেক বৈপ্লবিক বিলাপ করেন (তাও লুকিয়ে)। অনেক ন্যায় নীতির কথা বলেন। আসল কথা হল মানুষ খুন করে সেই জায়গায় একটা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা। এদের প্রথম অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় পুরুলিয়ায়। ওখানে কেন্দু পাতার দাম বৃদ্ধি নিয়ে প্রথমে এরা বিপ্লব (?) শুরু করে। তখন তা 'জনযুদ্ধ' নামে পরিচিত ছিল। সেই জনযুদ্ধ-ই আজ মাওবাদী নামে খ্যাতি পেয়েছে। অবশ্য নামে কি যায় আসে। সন্ত্রাসবাদীদের কোন নাম, জাত, ধর্ম থাকে না— ওদের একটাই নাম 'খুনী'। এই খুনী রক্তলোপুপ মাওবাদীরা মোটা মুটি পাঁচ জেলায় নিদেদের আধিপত্য বিস্তার করেছে। কিন্তু কি ভাবে?

গ্রামের আদিবাসী, অশিক্ষিত মানুষ যাঁরা শুধু এটুকু অনুধাবণ করতে পারেন যে দীর্ঘকাল ধরে লজ্জা-জনক ভাবে তাঁদের বরাতে জুটেছে অবহেলা। ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবা। শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে এদের, জীবিকার সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। এদিকে ঐ জঙ্গল মহলে কিছু ভুঁইবোড় নেতা হঠাৎ করে অনেক ধনসম্পত্তির মালিক হয়ে যাচ্ছে। জীবন যাত্রায় দেখা যাচ্ছে ব্যাপক ফারাক। কেন হয়ে যাচ্ছেন - তার উত্তরে শুধু এটাই বলা যেতে পারে ওরা শুধু মনদিয়ে 'পাটিটাই' করে। 'পাটি' —খায় না মাথায় দেয় ওসব কোন ব্যপার না শুধু দিনকে দিন ওদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান বেড়েই চলেছে। সঙ্গে রয়েছে চরম ঔদ্ধত্য। এই উদ্ধত নেতাদের আবার 'মনি মুক্তোর' মত প্রশ্রয় দিচ্ছেন ওদের অভিভাবক স্থানীয় নেতারা। মানুষ সব দেখছেন, বুঝছেন কিন্তু কিছু বলতে পারছেন না। বলতে গেলেই বিপদ— পার্টি অফিসে ডাক, জমি দখল, গ্রামে একঘরে হয়ে থাকা, পানীয় জল বন্ধ, পঞ্চায়েতের সমস্ত রকম সাহায্য বন্ধ। কারণ জনপ্রতিনিধিরা তো সরকারী সাহায্য কে নিজ পিতৃ সম্মতি বলে ভাবতে ভালোবাসেন। ফলে উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থ খরচ না হয়ে ফিরে যাচ্ছে অথবা চুঁইয়ে পড়েও সাধারণ মানুষদের কাছে আসছে না। অবশ্য এব্যাপারে কেন্দ্র রাজ্যের এক সুন্দর সম্পর্ক আছে। কেন্দ্র বলে রাজ্য নাকি টাকা খরচ করতে পারছে না, আবার রাজ্য বলে তারা নাকি বঞ্চনার শিকার। সুতরাং মানুষ কিছুই পায় না। আদিবাসীদের হতাশ ক্ষোভকে কাজে লাগায় মাওবাদীরা। এরপর শুরু হয় লাগাম ছাড়া সন্ত্রাস, কিন্তু প্রথমে 'জনসাধারণের কমিটি' নামে এক সংগঠনের বকলমে কাজ করে তারা। যাতে মানুষের বিশ্বাস তারা পায়। একাজে পুরোপুরি সফলও হয় তারা। ধীরে ধীরে তারা স্বমূর্তি ধরে। কোথাও পার্টি অফিস পোড়ানো, কোথাও নেতাদের বাড়ি আক্রমণ, কো্থাও দিবালোকে থাকায় ঢুকে পুলিশকে খুন, কোথাও প্রকাশ্য দিবালোকে বিচার সভা বসিয়ে শুধু শাসক দল করার অপরাধ খুন, কোথাও বা নিরক্ষর পিতার সাক্ষর কিশোরী কন্যাকে দিয়ে লেখানো 'আমার বাবা আর পার্টি করবে না।'

প্রথম দিকে সরল মনে আদিবাসী মানুষ অবস্থা পরিবর্তনের ব্যর্থ আশায় স্বেচ্ছায় এইসব কর্মকান্ডে যোগ দিয়েছে বা ক্ষেত্র বিশেষে তাঁদের দারিদ্র, অনুন্নয়ন, বঞ্চনাকে মূলধন হিসেবে কাজে লাগিয়ে স্রেফ বেনেট উঁচিয়ে আনুগত্য আদায় করে নেওয়া হয়েছে। আর রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে মাওবাদী তাদের কলমে চলা জনগনের কমিটির নামক শাখা সংগঠনের 'সংগ্রাম' যেভাবে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে চলছে তার মাশুল গুনতে হয়েছে কয়েকশো সাধারণ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে। আজকে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে 'শ্রেণী শত্রুর' বিরুদ্ধে লড়াইতে নেমে তারা কি 'গণশত্রু' হয়ে উঠছে। নাকি গণশত্রুরা রয়ে গেছে অন্তরালে। আধুনিক জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুষরা উন্নয়নের সঠিক সুফল পেলেও দেশের বিরাট এক অংশের মানুষের কাছে উন্নয়নের আলো এখনো পৌঁছায়নি। ব্যর্থতা কিসের পদ্ধতিগত নাকি প্রশাসনিক না-অন্য কোন কিছু ভাবনার বড়ই দরকার আজ। তবে একথা ঠিক যে উন্নয়নের এইঅসম বন্টনকেই হাতিয়ার করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগনকে সঙ্গে পেতে চেয়েছে মাওবাদীরা। মাওবাদীদের সঙ্গে যারা রয়েছেন তাঁরা সম্ভবত নিজেরাও জানেন না তারা কার বিরুদ্ধে লড়ছেন। আবার যারা রয়েছেন তাঁরা কি সবাই স্বেচ্ছায় আজ হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন? মনে হয় না, আর স্বেচ্ছায় মাওবাদ দীক্ষিত না হলেও কোনও সমস্যা নেই। পেশী শক্তি প্রদর্শন করে নিজেদের দলে টানতে ওদের খুব বেশী বেগ পেতে হয় না। কখনো কখনো ত্রানের টোপ দেখিয়ে সদ্য যুবক বা সদ্য গোঁফ গজানো কিশোরদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রশিক্ষণ শিবিরে। ফলে ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গল মহলকে গ্রাস করলো মাওবাদীরা। স্বভাবতই কেন্দ্র ও রাজ্য মিলে যৌধবাহিনী পাঠালো। কিন্তু তাতে কি হলো? মানুষ হত্যার খেলা তো এখনো চলছে। অনেক কমিটির নেতা গ্রপ্তার হয়েছেন। মাওবাদী সদস্যও ধরা পড়েছেন। অনেকে এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে। কিন্তু জঙ্গল মহল যা ছিল তাই আছে হয়ত

জায়গা বদল হচ্ছে, ধীরে ধীরে অন্য জেলাতেও ছড়াচ্ছে এর কালো থাবা। কিন্তু প্রথম দিকের চেয়ে আরো হিংস্রতা বাড়ছে। কখনো সেনাবাহিনীর উপর আক্রমন, কখনো ওদের দৃষ্টি পড়ছে ট্রেনের উপর - হচ্ছে ম্যনমেড দুর্ঘটনা, অথবা হাটে বাজারে প্রকাশ্য বিচার সভা বসিয়ে প্রাণদণ্ড-সঙ্গে দম্ভের বিবৃতি 'জনগন এদের শাস্তি দিচ্ছে'। কিন্তু এটা সত্যি যে আজ জনগন আর মাওবাদীদের সঙ্গে নেই। তাই সাধারণ আদিবাসীদের যে বিপ্লব তা কিন্তু এখন আর দেখা যায় না। সাধারণ মানুষ হয়তো বুঝতে পারল মাওবাদীরা হল মুদ্রার অপর পিঠ। এখন জঙ্গল মহল জুড়ে চলছে এক নতুন নাটক। মাওবাদী বনাম যৌথবাহিনী এবং মাওবাদী বনাম হার্মাদ বাহিনী। হার্মাদ বাহিনী হল শাসক দলের রক্ষক এক বাহিনী। প্রথমে এই হার্মাদ বাহিনী কাজ করত যাতে মাওবাদীরা না আক্রমন করতে পারে তাদের নেতাদের। এখন এরা কাজ করছে এলাকা দখলের জন্য। শাসক দল ভাবল এতদিনের সাধের মুক্তাঞ্চলকে বেদখল হতে দেওয়া যায় না। তাই তারাও ভাড়াটে সৈন্য, বিদেশী অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এলাকা পুর্নদখলের জন্য। এদিকে বিরোধী দলও চুপ করে বসে নেই। তাদেরও তরুন তুর্কী চর্কির মত ঘুরতে লাগল জঙ্গলমহলে। বিভিন্ন দলের নেতারা নিয়মিত আসলেন জঙ্গলমহলে। ব্যর্থ টলিউড ষ্টার; স্বঘোচিত বুদ্ধিজীবি মহল ঝাঁকে ঝাঁকে চললেন মিডিয়াকে সঙ্গে নিয়ে। প্রত্যেকে নিজেদের দেখাচ্ছেন কতখানি আদিবাসী দরদী তারা।

কিন্তু সত্যিকারের যাদেরকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল এই আন্দোলন তাদের কি হবে? ওদের তো বেতনের টাকায় বা জনগানের টাকায় সংসার চলে না। তাই তো তাঁদের কোন উপায়ে ভিটে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকতে হবে। তাই তারা পড়েছেন অদ্ভুত এক যাঁতা কলে। যৌথবাহিনী তল্লাশীর নামে অত্যাচার করছে। যখন তখন যাকে তাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। এভাবে প্রচুর মানুষ নিখোঁজ হয়ে গেছেন। আবার অনেক এমন কিছু ঘটনা ঘটছে, যার খবর মিডিয়া পাচ্ছে না। এদিকে যৌথবাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে মাওবাদীদের সমর্থন করলে জনগন দেখতে পাচ্ছে যৌথবাহিনী ও হার্মাদ বাহিনীর রক্তচক্ষু আর শাসক দলের ঝান্ডা হাতে নিলে মাওবাদীদের হাত থেকে রক্ষা নেই। উপায়? এভাবেই থাকতে হবে ওদের অর্থাৎ উলুখাগড়ার মত জীবন যাত্রা। মোটের উপর দেখা যাচ্ছে আদিবাসীদের কোন উন্নতি হয়নি বরং ওদের সঙ্গী হয়েছে নিয়মিত বনধ; ব্যবসায় সর্বনাশ, স্কুল, কলেজ, যানবাহন বন্ধ, উৎসব অনুষ্ঠান বন্ধের মত কার্যকলাপ। অর্থাৎ এক পা এগোতে গিয়ে তিন পা পিছিয়ে গেছে জনগন। কযেকটা টিউবওয়েল, একটু রাস্তা সারাই, নতুন ট্রেন ও স্টেশন উদবোধন করলে বা আদিবাসীদের সঙ্গে ফুটবল খেললে হয়তো কিছু হাততালি পাওয়া যাবে। কিন্তু আদিবাসীদের কোন উন্নতি হবে না।

দেশের ও রাজ্যের সরকার নিশ্চয় মনে রাখবেন যে আর্থসামাজিক উন্নয়ন না হলে প্রকৃত অর্থে কোনও উন্নয়নই হয় না। কোন সন্দেহ নেই যে, পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে কাম্য উন্নতি হয়নি এবং যে কারণে ক্ষোভের কারণ স্বাভাবিক। অনেকে মনে করনে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে দারিদ্র থাকবে এবং এই রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতরে সামাজিক ন্যায় সম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে কিছু সমস্যার সুরাহা করা যেতে পারে। জীবন ও জীবিকার উন্নয়নের সাধারণ উপাদান ও উপকরণ যেমন রাস্তাঘাট, পাকা রাস্তা, পানীয় জল, শুষ্ক এলাকায় জল সংরক্ষণের প্রকল্প, সৌরবিদ্যুৎ, নিয়মিত পড়াশুনো হবে এমন স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র যেখানে নিয়মিত প্রয়োজনীয় ওষুধ পাওয়া যাবে এবং বিপিএল কার্ড এবং গ্রহণযোগ্য খাদ্যের সরবরাহ এগুলি নিশ্চিত করতে হবে। এই সাধারণ মানের উন্নতির জন্য যেমন কোনও 'বিপ্লবের' প্রয়োজন হয় না, তেমন আগামী দিনে যারা সরকার গঠন করবে বলে দাবী করছে তাদেরও কোনও নিদির্ষ্ট পরিকল্পনা নজরে পড়েনি। মোদ্দা কথা হল সস্তা চটকদার কথা বার্তা বাদ দিয়ে রাজ্যের উন্নতি নিয়ে সৎ চিন্তার সময় এসেছে শাসক ও বিরোধী দুই দলের। জঙ্গলমহলে মিটিং করলাম, মিছিল করলাম মানে আমি আদিবাসীদের পাশে আছি, এমন ভাবনার সময় আর নেই, কেউ বিশ্বাস করবে না। মূল্যবোধের ও দায়িত্ব বোধের রাজনীতি গড়ে তুলতে পারলে তবে নৈরাজ্যের রাজনীতি পরাস্ত হয়। তার জন্য প্রথমেই দরকার রাজনৈতিকসংঘাত বন্ধ করা। মাওবাদীরা যদি অস্ত্র সংবরণ করে মুখোমুখি বসতে চায় তার পরিবেশ ঠিক করতে হবে। কারণ আদিবাসীদের উন্নতি করতে গেলে প্রথমেই যেটা করতে হবে ক্ষমতা দখলের লড়াই বন্ধ করতেই হবে। হয়তো ক্ষমতাহীনও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ভুলে গিয়েছে যে, ক্ষুধা ও ক্রোধের মধ্যে সীমারেখা ক্রমশ ঃ মুয়ে যাচ্ছে, আর ক্ষুধার্তের বিদ্রোহ কোন আইন মানে না।